# ‘বনলতা সেন’ জীবনানন্দের কাব্যচিন্তার কোরক

**নূরুন্নাহার ফয়জের নেছা***

## সারসংক্ষেপ

সকল শ্রেষ্ঠ ও মহৎ সৃষ্টিই যুগে যুগে পঠিত হয়, চর্চিত হয়, পাঠককে ভাবায়, আনন্দ দান করে। জীবনানন্দের ‘বনলতা সেন’ তেমনই একটি সৃষ্টি, যা বহুকাল ধরে পাঠক-সমালোচককে বর্ণনাতীত আনন্দ দান করে চলছে, তাদের কল্পনা ও সৌন্দর্যবোধকে তৃপ্ত করছে এবং নিশ্চিতভাবেই বলা যায় তা আরও বহুকাল অব্যাহত থাকবে। বনলতা সেন কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৪২ সনে। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩৬০ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত কবিতা - বিষয়ক পনেরোটি প্রবন্ধ নিয়ে ১৩৬২ সনে প্রকাশিত হয় কবিতার কথা শীর্ষক জীবনানন্দের মহামূল্যবান গ্রন্থটি। কবির অন্যান্য অনেক কবিতার মতোই বনলতা সেন গ্রন্থের প্রথম কবিতা 'বনলতা সেন' গভীর বিশ্লেষণে জীবনানন্দের কাব্যচিন্তার স্ফটিকস্বরূপ বলা যায়। বিশেষ করে ‘কবিতার কথা’, ‘কবিতা প্রসঙ্গে’, ‘কবিতার আত্মা ও শরীর' প্রভৃতি প্রবন্ধে প্রকাশিত তাঁর কবিতা-বিষয়ক চিন্তাগুলো অপূর্ব দীপ্তি ছড়িয়ে আছে এই কবিতায়। বর্তমান আলোচনায় ‘বনলতা সেন’ কবিতাটিকে এই সিদ্ধান্তের আলোকেই আস্বাদনের চেষ্টা করা হবে।

কবিতার সার্বজনীন সংজ্ঞার্থ দেওয়া যেমন প্রায় অসম্ভব একটি কাজ, তেমনি একটি কবিতা সম্পর্কেও চূড়ান্তভাবে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য বিশ্লেষণ বা মূল্যায়ন উপস্থাপন করা যায় না। তথাপি সমালোচকের কাজ অব্যাহত থাকবে, কাব্য আস্বাদনও চলবে নিরবধি কাল। ‘বনলতা সেন’ কবিতাটি বিশ্লেষণের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে সংক্ষেপে যদি দেখে নেয়া যায় তিনটি স্তবকের এই কবিতায় মোটের ওপর কী বলেছেন কবি তবে দেখব– প্রথম স্তবকে হাজার বছরের পথ পরিক্রমাশেষে তাঁর মানসপ্রতিমা বনলতা সেনকে খুঁজে পেয়েছেন কবি। দ্বিতীয় স্তবকে কবি নির্মাণ করেন তার সৌন্দর্যমূর্তি এবং কবির জীবনে তার আবির্ভাবের পটভূমি ও গুরুত্ব। তৃতীয় স্তবকে ঘটেছে কবির শিল্পিজীবনে বনলতা সেনের প্রতিষ্ঠা। এবারে

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিশদভাবে বোঝার জন্য এবং কবির অভিপ্রায়কে স্পর্শ করার দুঃসাধ্য অভিলাষে আমরা স্তবক পরম্পরায় এগিয়ে যেতে চাই।

> হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
> সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
> অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
> সেখানে ছিলাম আমি; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে;
> আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
> আমারে দু-দণ্ড শান্তি দিয়েছিলো নাটোরের বনলতা সেন।

কবিতার প্রথম স্তবকের প্রথম চারটি লাইনে বিধৃত হয়েছে বিগত শতাব্দীর বিলুপ্ত জগতের ধূসরলোকে কবির ভ্রমণবৃত্তান্ত। তিনি সিংহল সমুদ্র থেকে মালয় সাগরে ভ্রমেছেন, ছিলেন বিম্বিসার ও অশোকের জগতে এবং দূর অতীতের বিদর্ভ নগরে। বাস্তববুদ্ধিশাসিত পাঠকের কাছে এই বিবরণ হেঁয়ালির মতো ঠেকলেও আধুনিক কবিতার দীক্ষিত পাঠকের কাছে এর আবেদন অসীম। সমালোচকের বিশ্লেষণে

> জীবনানন্দের কবিতা ও কাব্যজিজ্ঞাসার এই পথিকটি যখন পথ চলতে থাকে, বারংবার পিছনে ফিরে তাকায়, ফিরে-ফিরে আসে, আগের বিন্দুটিতে ফিরে আসে, জীবনের সম্ভাবনাকে বিচার করে নেয়, তারপর, সময়ের অগ্রসৃতির ঋজুরৈখিকতায় নয়, কম্বুগ্রীব 'সময় প্রসৃতির' প্রবর্তনায় ভবিষ্যভাষণের প্যাটার্ন তৈরি করে নেয়। (দাশগুপ্ত, ২০০৭: ৮০ )

জীবনানন্দের কবিমানস গড়ে উঠেছে "পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধরে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নব-নব কাব্য-বিকীরণ" (দাশ, ২০০৯: ১৫) কে অঙ্গীভূত করে। সময়চেতনা এবং ইতিহাসচেতনা শুরু থেকেই তাঁর কবিতার অন্যতম শর্ত হয়ে উঠেছে। আলোচ্য পঙ্‌ক্তিচতুষ্টয়ের সার উদ্ধারে প্রথমেই তাঁর ব্যবহৃত উল্লেখগুলোর ইঙ্গিত বোঝা দরকার। কেননা জীবনানন্দের কথায়,

> শ্রেষ্ঠ কবিতার ভিতর একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় এই যে, মানুষের তথাকথিত সমাজকে বা সভ্যতাকেই শুধু নয়, এমন-কি সমস্ত অমানবীয় সৃষ্টিকেও যেন তা ভাঙছে এবং নতুন করে গড়তে চাচ্ছে; এবং এই সৃজন যেন সমস্ত অসঙ্গতির জট খসিয়ে কোনও একটা সুসীম আনন্দের দিকে।" (দাশ, ২০০৯: ২১)

বিম্বিসার এবং অশোক-এর উল্লেখ আমাদের স্মৃতিতে চকিতেই জাগিয়ে তোলে প্রাচীন ভারতের স্বর্ণযুগের প্রতিষ্ঠাতা দুই পরাক্রমশালী শাসকের কথা। ভারতীয় কলা ও মনন এই সময়ে তার চারিত্র্য ও উৎকর্ষ অর্জন করে। বিশেষত জৈন ও বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে এই দুই প্রতাপশালী রাজপুরুষের শাসনকালে। রচিত হয় ধর্মীয় শাস্ত্রগ্রন্থ, জ্ঞানচর্চার জন্য নির্মিত হয় বিহার, বৌদ্ধস্তূপ, স্তম্ভলিখন, গুহালিখন, বিশ্রামাগার এবং অসংখ্য মন্দির। বুদ্ধের মূর্তি ও বুদ্ধের শিক্ষাপদ্ধতির

বিভিন্ন স্মৃতিবহ চিত্র পাথর ও দেয়ালে খোদাই করার মধ্য দিয়ে বিকাশ লাভ করে ভারতীয় ক্লাসিক শিল্পের যুগ।

হর্যঙ্ক বংশের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি বিম্বিসার (খ্রিষ্টপূর্ব ৫৪৫-৪৯২)-এর রাজত্বকালে একদিকে মগধকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছিল প্রাচীন ভারতের প্রথম বৃহৎ সাম্রাজ্য এবং একই সঙ্গে একটি আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যের ভিত্তিও প্রতিষ্ঠিত হয়। "মহাবীর জৈন এবং গৌতম বুদ্ধ উভয়েই তাঁর রাজত্বকালে স্ব স্ব ধর্মমত প্রচার করেন। বিম্বিসার বৌদ্ধ ধর্মমত গ্রহণ করলেও, জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন।" (চট্টোপাধ্যায়, ২০১০: ১৬০) সে-সময়কার রাজাদের স্বভাবধর্মের বাইরে তাঁকে দেখা যায় যুদ্ধ নয় বরং প্রজার হিতকর বিভিন্ন কাজ যেমন, পথঘাট, বাঁধ ইত্যাদি নির্মাণ করতে এবং নিয়মিত রাজ্যপরিদর্শন করে প্রজাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ রক্ষা করতে। পরবর্তীকালে অশোকের মধ্যেও একই ধরনের প্রয়াস লক্ষিত হয় আরো ব্যাপকাকারে। ঐতিহাসিকের মতে, "বিম্বিসারের রাজত্ব থেকে মগধের অগ্রগতির ইতিহাস আরম্ভ হয়েছিল। তার অঙ্গজয়ের মধ্য দিয়ে ভারত ইতিহাসে যে অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল, কয়েক শতাব্দী পরে, অশোকের কলিঙ্গ জয়ের মধ্য দিয়ে তার সমাপ্তি ঘটেছিল।" (চট্টোপাধ্যায়, ২০১০: ১৫৬)

অন্যদিকে মৌর্যবংশের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি সম্রাট অশোক (খ্রিষ্টপূর্ব ২৭৩-২৩২ অব্দ) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রাচীন ভারতের সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্য, আয়তনে যা বর্তমান ভারতের চেয়েও বড় ছিল। কলিঙ্গ যুদ্ধ জয়ের মধ্য দিয়ে তাঁর সাম্রাজ্য এই বিশালতা অর্জন করলেও এই যুদ্ধে যে বিপুল সংখ্যক মানুষ হতাহত হয় এবং রক্তপাত ঘটে, যে বিপুলসংখ্যক লোক গৃহহীন হয় তা তাঁর জীবনে রূপান্তর সাধন করে। শাসনকালের অষ্টম বছরে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং দশম বছর থেকে ধর্ম প্রচারে তাঁর পূর্ণ শক্তি ও প্রয়াস প্রয়োগ করেন। একজন রুদ্রপ্রতাপ বিজেতা শাসক পরিণত হন ধম্মাশোকে, তিনি অহিংসাকে আদর্শরূপে গ্রহণ করেন এবং ইতিহাসের প্রথম কল্যাণরাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টার মুকুটটিও শোভিত হয় তাঁর শিরে। তিনি স্তম্ভলেখ এবং পর্বত ও গুহাগাত্রে বিভিন্ন লেখতে তাঁর বাণী প্রচার করা শুরু করেন। দ্বিতীয় কলিঙ্গ লেখতে তিনি বলেছেন, "সকল মানুষই আমার সন্তান। আমি যেমন আমার সন্তানদের জন্য ইহলোকে এবং পরলোকে সমৃদ্ধি এবং আনন্দ কামনা করি, সব মানুষের জন্য, আমি তাই করি।" রাজ্যজুড়ে তিনি অসংখ্য রাস্তাঘাট, জলাধার, বাঁধ এবং মানুষের পাশাপাশি পশুদের জন্যও বিশ্রামাগার, চিকিৎসালয় নির্মাণ করেন। যুদ্ধ নয় ধম্মের মাধ্যমে তিনি রাজ্যজয় করতে চেয়েছেন-মানুষের হৃদয় জয় করতে চেয়েছেন এবং কার্যত তিনি বৌদ্ধধর্মকে ভারতের বাইরে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিম্বিসারের মতো তিনিও বৌদ্ধধর্মের অনুসারী এবং অনুরাগী হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য সকল ধর্মের প্রতিই সহানুভূতিশীল ছিলেন। রাজ্যপ্রদক্ষিণ করে জনগণের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসতে তিনি উৎসাহী ছিলেন এবং

মৃগয়ার পরিবর্তে তিনি নিয়মিত ধম্মযাত্রায় যেতেন। প্রজাদের প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য তিনি শাসনব্যবস্থায় ও পরিবর্তন আনেন স্থানীয় প্রতিনিধি-প্রশাসক নিয়োগের মাধ্যমে। ঐতিহাসিকের মূল্যায়নে অশোকের ধর্ম ছিল "সরল এবং ব্যবহারিক, জটিল এবং দার্শনিক নয়। বৌদ্ধ ধর্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল না। তিনি জনসাধারণের ধর্মীয় আচরণ এবং কতকগুলি সাধারণ গুণের অনুশীলনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।" (চট্টোপাধ্যায়, ২০১০: ২৭৮-৭৯) যেমন, পিতামাতার প্রতি মান্যতার কথা, সকল জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শনের কথা ইত্যাদি। প্রাচীন ভারত ও পাকিস্তানের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থে হুইলার ভারতের ইতিহাসে সম্রাট অশোকের গুরুত্ব আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন,

Spiritually and materially his reign marks the first coherent expression of the Indian mind, and, for centuries after the political fabric of his empire had crumbled, his work was implicit in the thought and art of the continent. It is not dead today. ( Wheeler, 1959: 170 )

জীবনানন্দের কবিতায় ঐ একই স্তবকে এরপর উল্লেখ হিসেবে এসেছে বিদর্ভ নগরের কথা। খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে ভাকাটাকা গোত্র শাসিত এই বিদর্ভ নগরেই রয়েছে অজন্তা গুহার অন্ধকারে বৌদ্ধধর্মের বিকাশকালীন অপূর্ব সব গুহাচিত্র, বিগতকালের মানুষের কীর্তি তার সৌন্দর্যবোধ। ধারণা করা হয় এগুলোর সময়কাল খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে ৬৫০ খ্রিষ্টপূর্ব মধ্যে।

তাহলে যদি এ রকম ধরে নেয়া যায় যে, জীবনানন্দ আলোচ্য কবিতায় এই উল্লেখগুচ্ছের মধ্য দিয়ে তাঁর সমকালীন পৃথিবীর সামূহিক বন্ধ্যাত্বকে প্রকট করে তুলেছেন বিপরীতাভাসে, তবে বোধ করি খুব ভুল হবে না। কেননা,

> প্রভুত্বপ্রিয় ধুরন্ধর যুদ্ধবাজ শক্তিপিপাসুদের রাষ্ট্রনৈতিক কার্যকলাপ তখন থেকেই সারা বিশ্বের মানুষের কাছে উদ্‌ঘাটিত। সুতরাং এ সময়ে সৃজ্যমান অথবা প্রকাশিত বইতে গোটা সৃষ্টির নক্ত অর্থশূন্যতা নিয়ে বিবমিষা থাকবে না, সেটা হতেই পারে না :--- সমস্ত বড়ো কবিই তাঁর রচনাবলীর বিশ্বপটের অকপট প্রতিবিম্বন এক-একবার স্বীয় সৃজনে ধরিয়ে দিয়ে তারপর আবার মহাজাগতিক প্রবর্তনায় এগিয়ে যান। জীবনানন্দকেও 'বনলতা সেন'-এর মতো সুনম্র বর্ণালিতে ব্যাপ্ত বইখানির মধ্যে এ ধরনের শোচনীয় দৃশ্য গুঁজে দিতে হয়েছে। (দাশগুপ্ত, ২০০৭: ৩৬-৩৭)

সমালোচকের উক্তির সঙ্গে বিশেষ অসহমত পোষণের কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই, বরং জীবনানন্দের কবিপ্রতিভার প্রতি সুবিচার করতে হলে এই যুগচ্ছায়ার প্রলেপটি সরিয়ে দেখা দরকার। তবে তার আগে কবিতার সঙ্গে জীবনের সমস্যার সংযোগ বিষয়ে জীবনানন্দের ভাবনাটি জানা আবশ্যিক। নেহাতই যুগের সমস্যাখচিত কবিতা লেখা তাঁর কাছে সবসময়ই পদ্য রচনার নামান্তর। কিন্তু তার

অর্থ এই নয় যে তিনি কবিতায় জীবন-সমাজ-জাতির সমস্যার উদ্‌ঘাটন চান না। তাঁর মতে, সেই উদ্‌ঘাটন হতে হবে কবির নিজস্ব প্রণালীতে, সেটি আসবে

> সৌন্দর্যের রূপে, আমার কল্পনাকে তৃপ্তি দেবে; যদি তা না দেয় তাহলে উদ্‌ঘাটিত সিদ্ধান্ত হয়তো পুরোনো চিন্তার নতুন আবৃত্তি, কিংবা হয়তো নতুন কোনও চিন্তাও (যা হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে, কিন্তু তবুও তা কবিতা হল না, হল কেবল-মাত্র মনোবীজরাশি। (দাশ, ২০০৯: ১৮)

অর্থাৎ তিনি যুগের ব্যাধিকে তুলে ধরলেন ঠিকই কিন্তু তার চেয়েও অধিক কিছু যা কবির নিজস্ব জগৎ সেটিই তাঁর কাছে মুখ্য এবং সেটি অবশ্যই কাব্যের খরা-শিল্পের বন্ধ্যাত্ব।

জীবনানন্দ ঐ বিগত শতাব্দীতে কেবল দুজন মহান শাসককেই দেখেন নি, দেখেছেন আরো দুজন মহান পুরুষ গৌতম ও মহাবীরকে, তাঁদের চিত্তবৃত্তির মহত্তম প্রকাশ-তাঁদের চিৎপ্রকর্ষ। এই মহান পুরুষদের প্রভাবে যে শাসকদের ব্যক্তিগত জীবনই শুধু নয় জাতীয় জীবনেও এসেছিল উল্লেখযোগ্য ও অভূতপূর্ব পরিবর্তন। ঐসব গত শতাব্দীতে কেবল যে যুদ্ধ নয় হিংসা নয় বরং নির্বিশেষ প্রাণীর প্রতি অহিংস আচরণ ও সহানুভূতি, এক উদার মানবিক ও নৈতিক আচরণের অনুশীলন, শাসক ও শাসিতের সম্পর্কের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন, মানবকল্যাণমুখী এক সার্বিক উৎকর্ষই দেখেছেন কবি এমন নয়। এসব কিছুই তাঁকে চমকিত করেছে কিন্তু তাঁর কল্পনাকে তৃপ্তি দিয়েছে সেকালের মানুষের সৃজনশীলতা, সৌন্দর্যবোধ। ভারতীয় কলা ও মননের এক উজ্জ্বলতম প্রকাশ যে ঐতিহ্য গড়ে তুলেছে, কালের স্রোত গড়িয়ে যা এখনও অমর হয়ে আছে, সেটিই সঙ্গতির সৌন্দর্য পেয়েছে তাঁর কল্পনায়। তাঁর কথায়,

> মানুষ– সে যে অনৈতিহাসিক শতাব্দীতেই প্রথম হোক না কেন-একটা বিশেষ রস সৃষ্টি করল যা দর্শন বা ধর্ম বা বিজ্ঞানের রস নয়,-যাকে বলা হল কাব্য (বা শিল্প)-যার কতগুলো ন্যায্য পদ্ধতি ও বিকাশ রয়েছে; যার আস্বাদে আমরা এমন একটা তৃপ্তি পাই, বিজ্ঞান বা দর্শন এমন-কি ধর্মের আস্বাদেও যা পাই নাড় (দাশ, ২০০৯ : ১৭)

কবিতার প্রথম স্তবকের পঞ্চম পঙ্‌ক্তিটি আমাদের এতক্ষণের উদ্‌ঘাটনের পক্ষে অনেকগুলো সঙ্কেত দিয়ে যায়। প্রথমত তিনি 'ক্লান্ত প্রাণ এক এবং দ্বিতীয়ত তাঁর চারিদিকে 'জীবনের সমুদ্র সফে'। আমরা এর একটি অর্থ বের করতে পারি যে, কবি তাঁর চারপাশের কোলাহলমুখর ভিড়ের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ, আউটসাইডার। হিংসোন্মত্ত রুগ্‌ণ পৃথিবী তাঁকে ক্লান্ত করে তুলেছে। যেটি খুব সঙ্গত একটি ভাবনা।

পাশাপাশি আমরা কি এ-ও ভেবে নিতে পারি না যে, তাঁর চারপাশে কবিতার নামে যে অজস্র পদ্য রচিত হচ্ছে বা হয়েছে 'উপকবি'দের হাতে, যেখানে "সমাজশিক্ষা, লোকশিক্ষা, নানা রকম চিন্তার ব্যায়াম ও মতবাদের প্রাচুর্যই পাঠকের চিত্তকে খোঁচা দেয় সবচেয়ে আগে এবং সবচেয়ে বেশি করে; কিন্তু তবুও যাদের প্রভাব ক্ষণস্থায়ী, পাঠকের মন কোনও আনন্দ পায় না, কিংবা নিম্নস্তরের তৃপ্তি বোধ করে শুধু, এবং বৃথাই কাব্যশরীরের আভা খুঁজে বেড়ায়।" (দাশ, ২০০৯: ১৬)– এসবই তাঁকে ক্লান্ত করছে। সকলে যেমন কবি নয়, তেমনি সকলেই কবিতার পাঠকও নয় বলে দৃঢ় বিশ্বাস কবির। তাই জনসাধারণরূপী দীক্ষাহীন অবোদ্ধা পাঠকের 'ভিড়ও তাঁকে' ক্লান্ত করে। তিনি জানেন এই ভিড়ের হৃদয়' যতদিন না পরিবর্তন হবে, ততদিন প্রথম শ্রেণির কবি নির্বাসিত থেকে যাবেন এবং জন্ম নিতে থাকবে 'কয়েকটি তৃতীয় শ্রেণির' কবি, "মানব-সমাজ ও সভ্যতার ভিতর কোনও প্রথম শ্রেণির কাব্যের প্রবেশের পথ থাকবে না;" (ঐ: ২১)– এই উপলব্ধিই তাঁকে পীড়িত করছে, ক্লান্ত করছে– কেবলই নিঃসঙ্গ করে তুলছে। তিনি দেখেন "তথাকথিত সভ্যতা কোনও এক দারুণ হস্তীজননীর মতো যেন বুদ্ধিস্খলিত দাঁতাল সন্তানদের প্রসবে-প্রসবে পৃথিবীর ফুটপাথ ও ময়দান ভরে ফেলছে।" (ঐ: ২২)

তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রকৃত কবিতা, প্রকৃত সৌন্দর্য, প্রকৃত শিল্পের সন্ধানই (quest) এই কবিতার প্রথম স্তবকের নিহিতার্থ। জীবনানন্দের ভাষায় প্রকৃত কবির "হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে এবং তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধরে এবং তাদের সঙ্গে-সঙ্গে আধুনিক জগতের নব-নব কাব্য-বিকীরণ তাদের সাহায্য করছে।"(ঐ: ১৫) এবং কবি তাঁর "কল্পনা-মনীষার সাহায্যে যেন কোনও মহান-কোনও আদিম জননীর নিকট-যেন কোনও অদিতির নিকট প্রশ্ন, বারংবার প্রশ্নের বেদনা, প্রশ্নের তুচ্ছতা; বারংবার প্রতি যুগের স্তরে স্তরে যেন কোনও নতুন সৃষ্টির বেদনা ও আনন্দ; অবশেষে এক দিন সমস্ত চরাচরের ভিতর সকলের জন্যে কোনও সঙ্গতির সৌন্দর্য পাওয়া যাবে বলে।"(ঐ: ২২)

তবে কি এ কারণেই তাঁর এই হাজার বছরের পথ পরিক্রমা? পেয়েছেন কি তিনি সকলের জন্য কোনো সঙ্গতির সৌন্দর্য? এর উত্তর রয়েছে এই স্তবকের শেষ লাইনে। ক্লান্ত কবিকে 'দু-দণ্ড শান্তি' দিয়েছিল 'নাটোরের বনলতা সেন'। তিনি খুঁজে পেয়েছেন তাঁর মানসপ্রতিমা। দ্বিতীয় স্তবকে কবি গড়েছেন তার সৌন্দর্যমূর্তি, বলেছেন তাঁর জীবনে এই নারীর আবির্ভাবের পটভূমি এবং গুরুত্ব।

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য; অতিদূর সমুদ্রের' পর
হাল ভেঙ্গে যে নাবিক হারায়েছে দিশা

> সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
> তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে; বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'
> পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

প্রথম পঙ্‌ক্তি এবং দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির অর্ধাংশ রচনা করেছে বনলতা সেনের সৌন্দর্যমূর্তি। প্রসঙ্গত এখানে বুদ্ধদেব বসুর মূল্যায়ন স্মরণ করা যেতে পারে,

> এই দুই নগর যেমন লুপ্ত, সুদূর, স্মৃতিভারাক্রান্ত, তেমনি কবির জীবনে বনলতা সেন নাম্নী নারী, কিংবা তিনি মানবীও নয়, এক স্বপ্নচারিণী, যাকে কখনো পাওয়া যাবে না, ভোলাও যাবে না।" (বসু, ১৯৯৯ : ৫৭)

বুদ্ধদেব বসুর মূল্যায়নটি স্মরণ রেখেই আমরা কি এভাবে ভাবতে পারি না যে, কবি তাঁর মানসপ্রতিমার সৌন্দর্য রচনা করতে গিয়ে লুপ্ত জগৎতকে নতুন প্রাণ দিয়েছেন? বনলতার সৌন্দর্য আমাদের স্মৃতিতে জাগিয়ে তোলে বিদিশা ও শ্রাবস্তীর কারুকার্যের সৌন্দর্য। একটি প্রাচীন ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা পায় বর্তমানের সৃষ্টিতে, 'পশ্চাতে'র 'অনেক বিগত শতাব্দী'র সঙ্গে জীবনানন্দের আধুনিক চৈতন্য রচনা করে সঙ্গতির সৌন্দর্য। একটি ক্লাসিক যুগের সৌন্দর্যবোধ আধুনিক কবির সৌন্দর্যচেতনার সঙ্গে আত্তীকৃত হয়।

প্রিয়ার রূপ বর্ণনার পর কবি তাঁর প্রেমের স্বরূপ তুলে ধরেন। সমুদ্রে হাল ভাঙা নাবিকের চিত্রকল্পে ভেসে ওঠে দিশাহীন এক বিপন্ন মানুষের চিত্র এবং তার চোখ যখন অকস্মাৎ 'সবুজ ঘাসের দেশ' দেখে 'দারুচিনি-দ্বীপের' ভেতর, তখন সে পায় বাঁচার আশ্বাস, মুক্তির আনন্দ, আশ্রয়ের সন্ধান, শুশ্রূষার কোমল পরশ। কবির জীবনেও এই নারী সেই আশ্রয় ও শুশ্রূষার আশ্বাস নিয়ে এসেছিল। 'পাখির নীড়ের সঙ্গে বনলতা সেনের চোখের সাদৃশ্য কল্পনার অভাবিত উদ্ভাবনায় সেই আশ্রয়ের আশ্বাস আরো গভীর ও নিহিত সত্য হয়ে প্রকাশিত হয়। প্রেম যে কেবল নারী-পুরুষের হৃদয় ও শরীরের সম্পর্ক নয় বরং বিপন্ন জীবনে তা নিয়ে আসতে পারে পরম আশ্রয় ও শুশ্রূষার আশ্বাস, জীবনানন্দের কবিতায় পাঠকচিত্ত নতুনতর এই উপলব্ধিতে উত্তীর্ণ হয়।

কিন্তু বনলতা সেনের জিজ্ঞাসা আমাদের ভাবনাকে এখানেই থামতে দেয় না। 'এতদিন কোথায় ছিলেন?' এই জিজ্ঞাসা কি দ্যোতিত করে না যে বনলতা সেনও কবির অপেক্ষায় ছিল? তবে কি বনলতা সেন কেবল নিছক মানবী-ই নয়, তার চেয়েও বেশি কিছু? সে কি তবে কবির সৃষ্টিলোক, তাঁর অলকাপুরীর বিরহী প্রিয়া? প্রিয়তমের আগমনের পথ চেয়ে কাটাচ্ছে বিফল দিবস-রজনী? সে কি প্রকারান্তরে বন্ধ্যা কাব্যভূমি, যে ফলে ওঠার অপেক্ষায় আছে? সেও যেমন কবির একান্ত আশ্রয়– তাঁর কবিতার ক্ষেত্র, তেমনি কবিও কি তার একান্ত নির্ভর? যদি বলা যায় এলিয়টের ওয়েস্টল্যান্ড কাব্যের Holy Grail কিংবা বিষ্ণু দে-র 'ঘোড়সওয়ার'-এর মতো করে

না হলেও জীবনানন্দের বনলতা সেন আরও গভীর ও ব্যাপকতর অর্থে তাঁর সৃজন-'বেদনার নিদান, তবে বাড়িয়ে বলা হবে কি?

কেননা এরপরই আমরা এই কবিতার শেষ স্তবকে দেখব পাল্টে যাচ্ছে কবিতার tone -

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল;
পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল;
সব পাখি ঘরে আসে– সব নদী-ফুরায় এ-জীবনের সব লেন দেন;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

দিবাবসান, স্তব্ধতা, অন্ধকার সৃজনের পট রচনা করছে কবির জন্য। সবকিছুই এখানে ঘটছে কবির 'নিজস্ব প্রণালী'তে। তাই কর্মক্লান্ত সমস্ত দিনের শেষে সন্ধ্যা নামার পরিচিত ঘটনা রহস্যময় হয়ে ওঠে অশ্রুতপূর্ব শব্দ এবং অনাঘ্রাত গন্ধের অনুভবে। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো প্রখর হয়ে ওঠে শিশিরের শব্দ শোনার জন্য, চিলের ডানার রৌদ্রের গন্ধ আঘ্রাণের অভাবনীয় আকাঙ্ক্ষায়। তারপর পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে পাণ্ডুলিপির আয়োজন শুরু হয়, জোনাকির ঝিলমিল আলোয় সৃষ্টি হয় সুন্দরের গল্প-সৌন্দর্যের সৃজন। ঠিক যেন প্রেক্ষাগৃহে কিংবা মঞ্চে অভিনয় শুরুর আগ মুহূর্তে সব আলো নিভে যায় এবং অন্ধকারে জ্বলে ওঠে এক ভিন্ন জগতের গল্প। কাব্যের জন্ম বিষয়ে জীবনানন্দ যা বলেছেন সেটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে–

'পৃথিবীর সমস্ত জল ছেড়ে দিয়ে যদি এক নতুন জলের কল্পনা করা যায়, কিংবা পৃথিবীর সমস্ত দীপ ছেড়ে দিয়ে এক নতুন প্রদীপের কল্পনা করা যায়– তা হলে পৃথিবীর এই দিন, রাত্রি, মানুষ ও তার আকাঙ্ক্ষা এবং সৃষ্টির সমস্ত ধুলো, সমস্ত কঙ্কাল ও সমস্ত নক্ষত্রকে ছেড়ে দিয়ে এক নতুন ব্যবহারের কল্পনা করা যেতে পারে, যা কাব্য; অথচ জীবনের সঙ্গে যার গোপনীয় সুড়ঙ্গ-লালিত সম্পূর্ণ সম্বন্ধ : সম্বন্ধের ধূসরতা ও নূতনতা।' (দাশ, ২০০৯: ২০)

সব পাখি ঘরে ফেরার পর, সব নদী ফুরিয়ে যাবার পর চরাচরে যে শূন্যতা নেমে আসে, কবি তাকে উপলব্ধি করেন। বস্তুবিশ্বের সংঘাত-উত্থিত যে বাস্তব-জীবন, তার সব লেন-দেন ফুরিয়ে গেলে থাকে অন্ধকার আর বনলতা সেনরূপী তাঁর "ভাবপ্রতিভাজাত অন্তঃপ্রেরণা" (দাশ, ২০০৯: ৪৫) যাকে তিনি সময়-ইতিহাস ও ঐতিহ্যচেতনা দ্বারা সুগঠিত করে নিয়েছেন। সেই অন্ধকারে জ্বলে ওঠে তাঁর হৃদয়– শুরু হয় কবিতার জনন। কবির কথায়, "নীহারিকা যেমন নক্ষত্রের আকার ধারণ করতে থাকে তেমনই বস্তুসঙ্গতির প্রসব হতে থাকে যেন হৃদয়ের ভিতর; এবং সেই প্রতিফলিত অনুচ্চারিত দেশ ধীরে-ধীরে উচ্চারণ করে ওঠে যেন, সুরের জন্ম হয়;

এই বস্তু ও সুরে পরিণয় শুধু নয়, কোনও কোনও মানুষের কল্পনা-মনীষার ভিতর তাদের একাত্মতা ঘটে– কাব্য জন্ম লাভ করে।" (ঐ: ২১) বস্তুলোকের যেখানে শেষ সেখানে কবির জগৎ, সেখানে থাকেন কবি আর তাঁর বনলতা সেন। সৃষ্টি হয় তাঁর শিল্পলোক, তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর কবিতার জগৎ।

কবিতাটিকে আরো স্পষ্ট করে বোঝার জন্য জীবনানন্দের কবিমানসে আইরিশ কবি ডব্লিউ.বি.ইয়েটস (১৮৬৫-১৯৩৯) ও উনিশ শতকের বিশিষ্ট সাহিত্য ও চিত্রসমালোচক ওয়াল্টার পেটার (১৮৩৯-১৮৯৪)-এর শিল্পভাবনার গভীর প্রভাব স্মরণ করা যেতে পারে। ওয়াল্টার পেটার তাঁর *The Renaissance* (১৮৭৩) গ্রন্থে "Leonardo Da Vinci" শীর্ষক প্রবন্ধে ভিঞ্চির আঁকা বিখ্যাত চিত্রকর্ম La Gioconda-র যে ব্যাখা করেছেন তা বলা যায় আজ পর্যন্ত কোনো চিত্রকর্মের ওপরে লেখা সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ লেখা। এই ব্যাখ্যাসূত্রেই প্রকাশিত হয়েছে মোনালিসাকে ঘিরে তাঁর শিল্প ও সৌন্দর্যভাবনার অভিনব ভাবনাবীজ যা পরবর্তীকালে কবি ইয়েটসকে প্রভাবিত করেছে এবং তিরিশের বাংলা কবিদের মধ্যেও তার নিকট ও দূর স্পন্দন লক্ষ করা যায়। তাঁর বিশ্বাস ভিঞ্চি আশৈশবই তাঁর স্বপ্নে মোনালিসার ছবি এঁকে চলেছেন কিন্তু তাঁর এই শিল্পপ্রতিমাকে শেষপর্যন্ত চিত্ররূপ তিনি তখনই দিতে পেরেছেন যখন বাস্তবে তাকে পেয়েছেন জ্যোকন্দার ঘরে। ঐ প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি বলেছেন–

> The presence that thus rose so strangely beside the waters, is expressive of what in the ways of a thousand years men had come to desire. Hers is the head upon which all "the ends of the world are come," and the eyelids are a little weary. It is a beauty wrought out from within upon the flesh, the deposit, little cell by cell, of strange thoughts and fantastic reveries and exquisite passions. Set it for a moment beside one of those white Greek goddesses or beautiful women of antiquity, and how would they be troubled by this beauty, into which the soul with all its maladies has passed! All the thoughts and experience of the world have etched and moulded there, in that which they have of power to refine and make expressive the outward form, the animalism of Greece, the lust of Rome, the reverie of the middle age with its spiritual ambition and imaginative loves, the return of the Pagan world, the sins of the Borgias. She is older than the rocks among which she sits; like the vampire, she has been dead many times, and learned the secrets of the grave; and has been a diver in deep seas, and keeps their fallen day about her; and trafficked for strange webs with Eastern merchants: and, as Leda, was the mother of

> Helen of Tro–, and, as Saint Anne, the mother of Mary; and all this has been to her but as the sound of lyres and flutes, and lives only in the delicacy with which it has moulded the changing lineaments, and tinged the eyelids and the hands. The fancy of a perpetual life, sweeping together ten thousand experiences, is an old one; and modern thought has conceived the idea of humanity as wrought upon by, and summing up in itself, all modes of thought and life. Certainly Ladz Lisa might stand as the embodiment of the old fancy, the symbol of the modern idea. (Pater, 1873: 103-104)

উদ্ধৃতাংশের প্রথম কয়েকটি লাইনে পেটার বলছেন, হাজার বছর ধরে মানব যা কামনা করে এসেছে সেই আকাঙ্ক্ষার মূর্তরূপই যেন জলরাশির পাশে উপবিষ্টা মোনালিসার প্রতিকৃতি। রক্তমাংসের নারী জ্যোকন্দাকে ঘিরে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি হল তাকে তিনি মিলিয়ে দিলেন বিগতকালের ইতিহাস-ঐতিহ্য-শিল্প-পুরাণের সঙ্গে। পৃথিবীর তাবৎ চিন্তা ও অভিজ্ঞতা যেন রূপ পেল মোনালিসাকে ঘিরেই। জ্যোকন্দার মধ্যেই যেন তিনি দেখতে পেলেন হেলেনের মাতা লিডাকে, মেরির মাতা সেইন্ট অ্যানকে– যে পাথরগুলোর পাশে মোনালিসা উপবিষ্ট, সে যেন তার চেয়েও প্রাচীন।

পেটারের এই অভূতপূর্ব উদ্ভাবনায় কবি ইয়েটস গভীরভাবে আলোড়িত হযেছিলেন। তাঁর ১৯০০ সালে প্রকাশিত "The Szmbolism of Poetry" শীর্ষক প্রবন্ধে কবিতায় প্রতীকয়ানের আলোচনাসূত্রে পেটারের বিশ্লেষণের অনিবার্য ছায়াপাত কবির কাব্যচিন্তায় পেটারীয় ভাবনার প্রভাবকেই স্পষ্ট করে–

> if I look at the moon herself and remember any of her ancient names and meanings, I move among divine people, and things that have shaken off our immortality, the tower of ivory, the queen of waters, the shining stag among enchanted woods, the white hare sitting upon the hilltop, the fool of Faery with his shining cup full of dreams, and it may bel 'make a friend of one of these images of wonder,' and 'meet the Lord in the air.' (Yeats, 1961: 161-162)

যে-কথা পেটার মোনালিসা প্রসঙ্গে বলেছেন সেই একই কথা ইয়েটস বলেছেন তাঁর "intellectual symbol Moon" সম্পর্কে। ইয়েটসের মতে,

> Besides emotional symbols, symbols that evoke emotions alone, and in this sense all alluring or hateful things are symbols, although their relations with one another are too subtle to delight us fully, away from rhythm and pattern, there are intellectual symbols, symbols that evoke ideas alone, or ideas mingled with emotions; and outside the very definite traditions

> of mysticism and the less definite criticism of certain modern poets, these alone are called symbols. (Yeats, 1961: 160)

পেটার এবং ইয়েটস উভয়েই এখানে বিশ্লেষণী দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদের অভীষ্ট বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করেছেন এবং উভয়েরই পর্যবেক্ষণের বিষয় নারী তথা আদর্শ নারীর কল্পমূর্তি সম্পর্কিত এবং বর্ণনাতীত রহস্যময় সৌন্দর্য রচনাকে ঘিরে। আরো লক্ষণীয় তাঁদের নারীভাবনা তথা শিল্প ও সৌন্দর্যভাবনা নিজ নিজ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধারণ করেই প্রস্ফুটিত। ইয়েটসের চাঁদ হয়ে ওঠে, 'the tower of ivory, the queen of waters, the white hare sitting upon the hilltop, the fool of Faery with his shining cup full of dreams'

জীবনানন্দের 'বনলতা সেন' কবিতায় কি সেই একই মর্মকথা ধ্বনিত হয় নি? পেটারের উদ্‌ঘাটনে ভিঞ্চির মতোই কবিও যেন বহুকাল ধরে সুদূর অতীতের ধূসর জগতে তাঁর শিল্পপ্রতিমার সন্ধানে সতত ভ্রাম্যমাণ। বাস্তবের ভূগোলে (নাটোরের বনলতা সেন) এসে যেন সেই অন্বেষণ পরিণতি পেল। তিনিও তাঁর এই সৌন্দর্যমূর্তিকে রহস্যঘনতা ও একটি আদর্শ নারীমূর্তি দান করেছেন তাঁর নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির রসসিঞ্চনে। সবশেষে রক্তমাংসের দেহ অতিক্রম করে বনলতা সেন হয়ে ওঠে তাঁর আদর্শ নারী তথা তাঁর শিল্পপ্রতিমা– তাঁর "intellectual symbol"। তাই পেটারের ক্ষেত্রে লেডি লিসা, ইয়েটসের ক্ষেত্রে চাঁদ আর জীবনানন্দের বনলতা সেন হয়ে ওঠে শিল্পীর নিজস্ব প্রতীক যা তাঁদের আবেগ ও চিন্তাকে এবং সেইসঙ্গে ইতিহাস-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধারণ করে কিংবা জাগ্রত করে। কেননা পেটারের কথায় 'Certainly Ladz Lisa might stand as the embodiment of the old fancy, the symbol of the modern idea।' এই মর্মবাণীই যেন গুঞ্জরিত হয় জীবনানন্দের কাব্যবিশ্লেষণে–

> পুরোনোর ভিতরে সেই নতুন কিংবা সেই সজীব নতুন যদি আমার কল্পনাকে তৃপ্ত করতে পারে, আমার সৌন্দর্যবোধকে আনন্দ দিতে পারে, তাহলে তার কবিতাগত মূল্য পাওয়া গেল; .. কল্পনার আভায় আলোকিত হয়ে এ-সমস্ত জিনিস যত বিশাল ও গভীর ভাবে সে নিয়ে আসবে কবিতার প্রাচীন প্রদীপ ততই নক্ষত্রের নূতনতম কক্ষ-পরিবর্তনের স্বীকৃতি ও আবেগের মতো জ্বলতে থাকবে। (দাশ, ২০০৯: ১৮)

জীবনানন্দ 'ভিড়ের হৃদয়ে'র পরিবর্তন চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর বহু কবিতা বোদ্ধা-অবোদ্ধা-অল্পবোদ্ধা নির্বিশেষে অগণিত পাঠকের হৃদয় জয় করে নিয়েছে। 'বনলতা সেন' কবিতাটিও সেই বহুনন্দিত কবিতার মধ্যে অন্যতম। কবিতাটির অন্তর্নিহিত অর্থ নিয়ে নানা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হয়েছে এবং হবে, কিন্তু সেসব বাদেও 'বনলতা সেন' এত পাঠকপ্রিয়তা পাবার কারণ বোধ করি এর কারুতার গুণ।

প্রতিটি ছয় পঙ্‌ক্তি সম্বলিত মোট তিনটি স্তবকে রচিত নিটোল এই কবিতাটি অপ্রতিরোধ্য সম্মোহনে পাঠককে মুগ্ধ করে চলে। স্তবকগুলোতে প্রথম ও তৃতীয় লাইন, দ্বিতীয় ও চতুর্থ লাইন এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠ লাইনের মধ্যে অন্ত্যমিল দেখা যায়। এছাড়া পঙ্‌ক্তি মধ্যে শব্দে-শব্দে অন্ত্যমিল এই কবিতার লক্ষণীয় একটি বৈশিষ্ট্য। যেমন-

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,

কিংবা

থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

শব্দ নির্বাচন, পঙ্‌ক্তি মধ্যে শব্দের বিন্যাস, পরিচিত শব্দকে প্রয়োগনৈপুণ্যে নতুন চমক কিংবা বিশেষ তাৎপর্য দানে জীবনানন্দের দক্ষতা সীমাহীন। উদাহরণ হিসেবে 'অন্ধকার' শব্দটি নেয়া যেতে পারে।

সামগ্রিকভাবে জীবনানন্দের কাব্যভুবনে অন্ধকারের রাজত্ব দর্শনীয়ভাবে ফুটে উঠে। 'অন্ধকার'-এর চিত্রকল্প রচনায় কবি তাঁর কল্পনাপ্রতিভার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। এই কবিতায় 'অন্ধকার' শব্দটি মোট পাঁচবার ব্যবহৃত হয়েছে। পাকা জহুরী যেমন হীরকখণ্ডকে কেটে কেটে তার উজ্জ্বলতা বাড়ায়, কবিও শব্দটিকে যোজনের বিভিন্নতায়, তির্যকতায়, কৌণিকতায় তার বাচ্যার্থের চেয়ে ব্যঞ্জনার্থ বৃদ্ধি করেছেন। প্রথম স্তবকের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে 'নিশীথের অন্ধকারে' সিংহল সমুদ্র থেকে মালয় সাগরে পরিভ্রমণ অপেক্ষাকৃত দুষ্কর একটি অভিযাত্রার চিত্র তুলে ধরে। কিন্তু চতুর্থ লাইনের 'আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে' দূর অতীতের সমৃদ্ধ একটি নগরীর বিলুপ্তিকে সামনে নিয়ে আসলেও আমরা বুঝতে পারি বহু বিগত শতাব্দীর ধুলো সরিয়ে আজো অজন্তা গুহায় অন্ধকারে আলোকিত হয়ে আছে কত শত বছর পূর্বের মানুষের হাতে সৃষ্ট সমৃদ্ধ এক শিল্পভাণ্ডার। এই মহাকাব্যিক অভিযাত্রায় কবি তাঁর শিল্পপ্রতিমাকে খুঁজে পেয়েছেন একালের ভূগোলে। কিন্তু তিনি নিজ মানসপ্রতিমার রূপমাধুরী নির্মাণ করেছেন লুপ্ত নগরীর সৌন্দর্যেরর সঙ্গে সাযুজ্য কল্পনায়। তাঁর মানসী বনলতা সেনের চুল উপমিত হয়েছে 'অন্ধকার বিদিশার নিশার' সঙ্গে, সাদৃশ্য সূত্রটি লুপ্ত রেখে। তাই আমাদের ভেবে নিতে হয় এই সাযুজ্য কি অন্ধকার এবং চুলের কৃষ্ণবর্ণের গাঢ়-মসৃণ পেলবতার মধ্যে? না কি তা অশোক আর দেবীর প্রেমমদির বিদিশার নিশা, না কি কালিদাসের মেঘদূতের বিদিশা নগরীর সেইসব রূপসীদের সঙ্গে এই সাযুজ্য কল্পিত হয়েছে, যারা নিশাকালে অভিসারে বের হত? তাহলে এখানে 'অন্ধকার' শব্দটির একটি ইতিবাচক অর্থ দাঁড়ায়, যা তাঁর নায়িকার অনুপম সৌন্দর্যকে উজ্জ্বল করে তুলছে। কিন্তু যদি এই 'অন্ধকার' বুদ্ধদেব বসু কথিত লুপ্ত বা হারিয়ে যাওয়ার সাযুজ্যকল্পনা থেকে প্রযুক্ত হয় তবে তা অচরিতার্থ প্রেমকেই মূর্ত করবে। কিন্তু আমাদের মূল্যায়ন যেখানে জোর দিতে আগ্রহী, তা হচ্ছে কবির বনলতা সেনের চুলের সৌন্দর্য দূর অতীতের অন্ধকারের গর্ভে বিলুপ্ত

হওয়া প্রাচীন সৌন্দর্যকে নতুন করে আলোকিত করেছে। কবির বিশ্বাস এভাবেই 'কবিতার প্রাচীন প্রদীপ' "নক্ষত্রের নূতনতম কক্ষ-পরিবর্তনের স্বীকৃতি-ও-আবেগের মতো জ্বলতে থাকবে।"(দাশ, ২০০৯: ১৮)

দ্বিতীয় স্তবকের পঞ্চম লাইনে কবি যখন বলছেন 'দেখেছি তারে অন্ধকারে', তখন অন্ধকার নিশ্চিতভাবেই এক অভাবনীয় আলোর প্রতীতি দেয়। দিশাহীন, আশাহীন, বিপন্ন জীবনের অন্ধকারে বনলতা সেনকে দেখার বিষয়টি তখন অনেকগুলো ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। বনলতা সেন কি তবে তাঁর আরাধ্যা কল্পপ্রতিমা? কবির জীবনের আলোকবর্তিকা? তাঁর সৃজনশীল শিল্পিসত্তা? না কি তাঁর শিল্পের সারবত্তা– তাঁর কাব্যভুবন– তাঁর কবিতা– তাঁর একান্ত আশ্রয়?

কবিতার শেষ স্তবকের শেষ লাইনের 'অন্ধকার' শব্দচিত্রকল্পটি কবিতা জননের পূর্বাভাসকে দ্যোতিত করে। জীবনানন্দীয় কাব্যসৃষ্টির প্রক্রিয়া স্মরণ করলেই এই দাবির যৌক্তিকতা পাওয়া যাবে একটি-পৃথিবীর-অন্ধকার-ও-স্তব্ধতায় একটি মোমের মতন যেন জ্বলে ওঠে হৃদয়, এবং ধীরে-ধীরে কবিতা জননের প্রতিভা ও আস্বাদ পাওয়া যায়।" (দাশ, ২০০৯: ১৫-১৬)

বাক্যমধ্যে শব্দ এবং শব্দের ভেতরকার ধ্বনি নিয়ে জীবনানন্দ দক্ষ ম্যাজিশিয়ানের মতো ইচ্ছেমতো খেলা করেন। তাঁর হাতের মুঠোয় ধ্বনিগুলো নতুন মুদ্রার মতো বেজে ওঠে এবং দ্যুতি ছড়ায়। অনুপ্রাস অলঙ্কার এই কবিতার ছত্রে ছত্রে সৃষ্টি করেছে ধ্বনির অপরূপ ঝর্ণাধারার ঝিলিক।

জীবনানন্দ বলেছেন 'উপমাই কবিত্ব', যদিও শামসুর রাহমান এক সাক্ষাৎকারে পূর্বসূরির এই বক্তব্যকেই আরো একটু বিশ্লেষণ সাপেক্ষে বলেছিলেন, "অনেক সময় একটি উপমাই একটি কবিতাকে উৎরে দেয়। একটি কবিতা স্মরণীয় হয়ে থাকে একটি উপমার জন্যে, একটি চিত্রকল্পের জন্যে।" তবে জীবনানন্দের দাবি তাঁর কাব্য-বিবেচনায় সবিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এই কবিতায় তিনি এমন কিছু অভাবনীয় এবং অভিনব উপমা সৃষ্টি করেছেন যেগুলো 'উঁচু মঠের মতো যেন একটা মৌন সূক্ষ্মশীর্ষ আমোদের আস্বাদ' দিয়ে চলেছে।

১। চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য; (লুপ্তোপমা)

২। পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন। (পূর্ণ উপমা)

উল্লিখিত উপমা দুটি রচিত হয়েছে সাদৃশ্যের ন্যূনতম সূত্র ব্যতিরেকে। অথচ কবির অভিপ্রায়ের সঙ্গে রয়েছে গভীর সংযোগ। উপমা দুটির গূঢ় প্রতীতি প্রসঙ্গে আলোচ্য প্রবন্ধে ইতোমধ্যেই আলোচনা করা হয়েছে।

এই কবিতায় কবি আধুনিক কবিতার বিভিন্ন টেকনিক অত্যন্ত সফলভাবে প্রয়োগ করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখ, বিসদৃশ বা বিজাতীয়ের মধ্যে উপমার সাদৃশ্য রচনা, ইন্দ্রিয়ঘন চিত্রকল্প রচনা উল্লেখযোগ্য।

প্রাচীন ইতিহাস, ঐতিহ্য, ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, স্থান এখানে উল্লেখ হিসেবে এসেছে। ইন্দ্রিয়জাত চিত্রকল্পের অভাবিত অভিজ্ঞতা এই কবিতার অমূল্য সংযোজন।

যেমন-

১। সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতেন
সন্ধ্যা আসে; (শ্রুতিজাত চিত্রকল্প)

২। ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল; (ঘ্রাণেন্দ্রিয়জাত চিত্রকল্প)

এছাড়া 'অন্ধকার' চেতনাশ্রয়ী প্রতীকী চিত্রকল্পরূপে ব্যবহৃত হয়েছে এই কবিতায়ড় যার বিশদ আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে।

আলোচনা শেষে একথা দ্বিধা ও শঙ্কা ব্যতিরেকেই বলা যায় যে, বিষয়ের স্তরবহুল জটিল পাক ও নির্মিতির সৌষ্ঠব 'বনলতা সেন' কবিতাটিকে কেবল জীবনানন্দের কাব্যভুবনেই নয়, সমগ্র বাংলা কবিতার জগতেও একটি অনন্য সৃষ্টি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

## গ্রন্থাপঞ্জি

১। দাশগুপ্ত , অলোকরঞ্জন (২০০৭)। *জীবনানন্দ*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

২। দাশ, জীবনানন্দ [সম্পা.] (২০০৯)। *সমগ্র প্রবন্ধ, ভূমেন্দ্র গুহ*। কলকাতা

৩। বসু, বুদ্ধদেব (১৯৯৯)। *কালিদাসের মেঘদূত*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

৪। চট্টোপাধ্যায়, সুনীল (২০১০)। *প্রাচীন ভারতের ইতিহাস* (প্রথম খণ্ড)। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা

৫। Wheeler, Sir Mortimer (1959). *Early India and Pakistan to Ashoka*. New York

৬। Pater, Walter (1873). *The Renaissance*. The Modem Library, New York

৭। Yeats, W. B. (1961). *Essays and Introduction*. Macmillan & CO LTD, London

## তথ্যনির্দেশ

১। হুমায়ুন আজাদ কর্তৃক গৃহীত সাক্ষাৎকার, শামসুর রাহমানের মুখোমুখি, মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা, শামসুর রাহমান সংখ্যা, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ১২৮